-----(চিন্তা ও উদ্যোগ)-----

বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বাংলাদেশ

আশরাফ আলী

(১) অবতারণা

বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সংযুক্ত। তাই যে-কোন উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আলোচনা তুললে তার সাথে বিশ্ব-অর্থনীতি ব্যবস্থার কথা যুক্তিসঙ্গতভাবে চলে আসে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির সাথে বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যোগাযোগটি বুঝতে না পারলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন সমস্যার পুরো চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। আজ আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঠিক সংজ্ঞাকে সামনে রেখে এই যোগসূত্রটি উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবো। এর থেকে বোঝা যাবে বাংলাদেশে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত ফলাফল বার বার ঘুরে ফিরে ঘটে কেন এবং বাঞ্ছনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলি শুরু করা এত কঠিন কেন। এছাড়া কোন্ ধরণের উন্নয়ন নীতি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে বা হবে না তাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা

আশ্চর্যজনক মনে হলেও একথা সত্যি যে, উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে ‘অর্থনৈতিক উন্নয়ন’ বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে অর্থনীতিবিদের মধ্যে আজও দ্বিমত রয়ে গ্যাছে। এই মতবিরোধ অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়া উচিৎ। কারণ একদিকে বাংলাদেশের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় মাত্র ৪০০ মার্কিন ডলার হলেও পৃথিবীতে এমন দেশ আছে, যেমন, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাস্ট্র, ডেনমার্ক, জাপান, যেখানে জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ৪০,০০০ মার্কিন ডলার থেকেও বেশী। উন্নত দেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে নিজ নিজ দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করেছে।

একটি দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা আরেকটি দেশের অনুরূপ হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। একদিকে পশ্চিম ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাস্ত্র ও কানাডা, অন্যদিকে জাপান এবং সবশেষে এশীয় টাইগার্স (সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান), দ্বিতীয় প্রজন্মের এশীয় টাইগার্স (মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ইত্যাদি) ও চিনদেশ - সব মিলে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাবেশ। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অগ্রগতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আছে এবং লিপিবদ্ধ করার কাজ এখনও চলছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরও উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য আলাদা করে উন্নয়ননীতি আবিষ্কারের আবশ্যকতা আছে কিনা। কথায় বলে, নতুন করে চাকা আবিষ্কারের প্রয়োজন কি? এই কথা মনে রেখে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা পরোক্ষভাবে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাবে -

> বিশ্বের শিল্পোন্নোত জাতি, যেমন, জি-৭ দেশগুলিকে আমরা ‘অগ্রসর’ বা ‘উন্নত’ বলে আখ্যায়িত করি। একথা সত্যি বলে গ্রহণ করা হলে ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নে’র সংজ্ঞা এর ভিতরেই নিহিত থাকা উচিৎ এবং নতুন করে আরেকটি সংজ্ঞা আবিষ্কারের আবশ্যকতা নেই। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন নীতিমালা ও প্রকল্প এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে এই দেশগুলি জি-৭ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে ধাবিত হয়।

অশাস্ত্রীয় মনে হলেও এটি একটি অত্যন্ত সহজ ও কার্যকরী সংজ্ঞা। এর মধ্যে শাস্ত্রীয় গোঁড়ামী নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও সম্ভবতঃ এই সংজ্ঞার বিপক্ষে কথা বলার তত্ত্ববিদের অভাব হবে না। অনেকে অনেক ধরণের অজুহাত এনে হাজির করতে পারেন, যেমন, কোন্ দেশে কি ধরণের উৎপাদন-উপকরণ প্রাকৃতিকভাবে কি পরিমাণে পাওয়া যায়, পরিবেশ-দূষণের সম্ভাবনা কতটুকু, অথবা, স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, ইত্যাদি। এইসব অজুহাতের ভিত্তিতে তাঁরা বলতে পারেন - এই সংজ্ঞা হচ্ছে অনুকরণের সামিল, অবাস্তব, অথবা প্রয়োগের অযোগ্য। আমার মতে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এই সংজ্ঞা মৌলিকভাবে সঠিক। মোদ্দা কথা হচ্ছে, এতগুলো বিচিত্র উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে বাছাই করে কোন একটি ‘মডেল’ বাংলাদেশের জন্য কার্যকরীভাবে কাজে লাগানো যাবেই।

আজকের আলোচনা ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা’ দিয়ে শুরু করা হচ্ছে। এতে করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় আলোচনার জন্য একটি সাধারণ ও অভিন্ন মাপকাঠি তৈরী হবে। আমার মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক সুসমন্বিত বিশ্লেষণের কাজে উপরোক্ত সংজ্ঞার যথেষ্ট সর্বজনীনতা রয়েছে।

(৩) বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ

এক সময় ‘সমাজবাদ’কে বাংলাদেশের একটি অন্যতম রাস্ট্রনীতি হিসাবে গণ্য করা হতো। বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত ১৯৯৪-৯৫ সনের পরিসংখ্যান পকেটবই দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে আজকের আলোচনার খাতিরে আমরা ধরে নেবো, মুক্তবাজার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই বাংলাদেশের জন্য নির্বাচিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ। একথা বলার সাথে সাথে আমাদের মনে প্রশ্ন জেগে উঠা উচিৎ : মুক্তবাজার অর্থনীতি বিশ্বের অসংখ্য উন্নয়নশীল দেশে ঈপ্সিত ফলাফল আনতে কেন ব্যর্থ হয়েছে? আজকের নিবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হবে এবং আশা করা যাচ্ছে এর ফলশ্রুততি হিসাবে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যার সঠিক দিক-নির্দেশনাও পাওয়া যাবে। কারণ কথায় বলে, জানা-ই যুদ্ধজয়ের অর্ধেকটা।

বাজারভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘প্রতিযোগিতা’। এই প্রতিযোগিতা বিশুদ্ধ হবার প্রয়োজন নেই। ‘প্রতিযোগিতা’ অর্থনীতিতে দক্ষতা আনে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা আবার একচেটিয়াত্ব সৃষ্টি করতেও চায়। অন্য কথায়, ‘প্রতিযোগিতা’ পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার মধ্যে খুনে/শিকারী প্রবৃত্তি ঢুকিয়ে দেয়। যে-কোন দেশের জাতীয় সীমানার মধ্যে পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা রাস্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাস্ট্র একাধিক কোম্পানীর একত্রীকরণ এবং কোম্পানী ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রন করে। এইসব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনে রাস্ট্র পক্ষপাতিত্ব নেয় না। তবে ‘আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা’ প্রভাবিত হয় অংশগ্রহণকারী দেশের আপেক্ষিক অর্থনৈতিক শক্তিমত্তা দ্বারা এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাস্ট্র নিঃসন্দেহে তার নিজস্ব কোম্পানীর পক্ষ নেবে।

শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করার ফলে অনেক ক্ষেত্রে উন্নতমানের পণ্যদ্রব্য বাজারে এসেছে এবং আসছে, যেমন, উন্নতমানের মোটরগাড়ী, ট্রেন, টেলিভিশন, টেলিফোন, কম্পিউটার, ওষুধ, ও আরো অনেক আধুনিক দ্রব্য। অন্য ক্ষেত্রে এই দেশগুলির মধ্যে মারাত্মক বাণিজ্যযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে - উদাহরণ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাস্ট্র, ইউরোপ, জাপান, ইত্যাদি দেশের মধ্যকার সাম্প্রতিক বাণিজ্যযুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। লক্ষ্য করুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাণিজ্যযুদ্ধে যে-অস্ত্র ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহারের হুমকি দেওয়া হয় তা হলো ‘‘শুল্ক’’। অন্যায্য শুল্ক কাঠামো নিঃসন্দেহে মুক্তবাজার অর্থনীতির নীতিমালাকে লঙ্ঘন করে। আরো লক্ষ্য করুন, এক্ষেত্রে প্রায়শঃ যুদ্ধবিদ্যায় ব্যবহৃত পরিভাষা, যেমন, ‘‘বাণিজ্যযুদ্ধ’’, ব্যবহার ক’রে একথাই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় যে, বাজার কব্জা

করাটা একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, বাজার আয়ত্ত করার অর্থ হলো দেশের নাগরিকদের জীবনযাপনের মান উন্নত করা ও রাখা।

অপরদিকে, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে সংঘটিত প্রতিযোগিতা কখনো ন্যায্য বা সমকক্ষ হয়নি, হয়েছে একতরফা এবং ফলাফল সবসময় গিয়েছে উন্নত দেশের অনুকূলে। উন্নয়নশীল দেশ মূলতঃ শিল্পোন্নত দেশকে কাঁচামাল সরবরাহ করে এসেছে এবং শিল্পোন্নত দেশ তার প্রত্যুত্তরে স্বদেশে উৎপন্ন পণ্য উন্নয়নশীল দেশে বিক্রি করে আসছে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি 'রেন্ট' ও 'কমিশন' ভোগীদের কার্যকলাপে ভরে গিয়েছে। অবশ্য শিল্পোন্নত দেশেও বিদেশী পণ্যদ্রব্য বেচাকেনা চলে, কিন্তু সেখানে উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদনসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপই প্রাধান্য পায়। উল্টোদিকে, উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে বিদেশ থেকে আমদানী করা, অর্থাৎ শিল্পোন্নত দেশে উৎপন্ন পণ্য লেনদেনের প্রভাবই সর্বাধিক।

পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার ফলে অসম দুই শ্রেণীর দেশের মধ্যে ভিন্নধর্মী সম্পর্কের ভারসাম্য তৈরী হয়। এটি উন্নত দেশগুলির মধ্যে অস্তিত্বশীল ভারসাম্যের মতো নয়। উন্নয়নশীল দেশের সাথে অসম প্রতযোগিতার ফলে তা সেসব দেশে একটি রেন্ট ও কমিশন ভোগী শ্রেণী সৃষ্টি ও পোষণে উৎসাহিত করে এবং পর্যায়ক্রমে তা রেন্ট ও কমিশন সমর্থনকারী একটি সরকার ও একটি আমলাশ্রেণী সৃষ্টি ও পোষণে উৎসাহিত করে। পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসরণ করলে সহজেই বোঝা যাবে, উন্নয়নশীল দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানী তৈরী হয়ে তাদের কোম্পানীর সাথে যাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয় তার জন্য শিল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশে কর্মরত তাদের কোম্পানী ''যৌথভাবে'' যথাসাধ্যভাবে চেষ্টা করে।

সুতরাং শিল্পোন্নত দেশের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, যেমন, ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউ-এস-এ-আই-ডি), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (সি-আই-ডি-এ), সুইডিস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (এস-আই-ডি-এ) এবং এইসব শিল্পোন্নত দেশের ছত্রছায়ায় লালিত আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক (ডব্লিউ-বি), ইন্টারন্যাশনাল মনেটরী ফাণ্ড (আই-এম-এফ)-এর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঠিক নীতিমালা প্রবর্তনে সহযোগিতা করাটা 'অবৈজ্ঞানিক', কারণ তাতে তাদের নিজস্ব কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরী হবে। এবং এসব সংস্থা আসলেই কোনো সহযোগিতা করে না। বলে রাখা দরকার, এখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের উদ্দেশ্যে এর অন্তর্নিহিত 'বিজ্ঞান' নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করা আদৌ এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

আগেই বলা হয়েছে, সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টির পথ বন্ধ করতে গিয়ে এইসব দেশ ও তাদের সংস্থাগুলি অন্যান্য পন্থার মধ্য থেকে বাছাই করে বিশেষ একটি অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে - তা হলো উন্নয়নশীল দেশগুলিকে স্বদেশে প্রগতিবিরোধী শুল্ককাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে প্রবুদ্ধ করা। বাস্তবেও দেখা যায়, বাংলাদেশ ও অনুরূপ উন্নয়নশীল দেশের শুল্ককাঠামো সম্পূর্ণরূপে উন্নয়নবিমুখী। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে একটি ন্যায্য শুল্ককাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে তার পক্ষে উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। এর থেকে বোঝা যাবে, জটিল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিলাষ পূরণে সহায়তা করে না কেন।

প্রতিকূল শুল্ককাঠামো বর্তমান থাকার কারণে স্বদেশে প্রস্তুত যন্ত্রের নির্মাণমূল্য অতিরিক্ত পরিমাণ বেড়ে যায়। বাংলাদেশে শ্রমমূল্য অপেক্ষাকৃতভাবে কম হওয়া সত্ত্বেও নির্মাণমূল্য অনেকটা বেড়ে যায়। ফলে বাংলাদেশী নির্মাতারা বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যান। আমরা এর আগেও বলেছি, বাংলাদেশে একটি ন্যায্য শুল্ককাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই স্বদেশী উৎপাদকগণ ন্যায্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবেন। এর জন্য প্রতিরক্ষাধর্মী শুল্ককাঠামো প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন পড়বে না।

বিদেশী আর্থিক সাহায্যে চালিত বড় বড় প্রকল্পের কার্যকারিতা সম্বন্ধে এখানে কিছু মন্তব্য করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অভিযোগ করা হয়, বাংলাদেশে প্রকল্প ব্যর্থ হবার হার অনেক উঁচু। এর বৈজ্ঞানিক কারণ বোঝা ততটা কঠিন নয় : বাংলাদেশের অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় কেবল উচ্চমূল্যের পণ্য, যেমন, ‘ক্যাপিটাল গুড্স্’-এর চাহিদা জন্ম দেওয়ার জন্য। এই ধরণের পণ্য অধিকাংশ সময় বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। বাংলাদেশের ট্রেডারগণ এইসব প্রকল্পে যোগ দেন আমদানী-কমিশন হাতানোর উদ্দেশ্যে। আমলা ও সরকারী অফিসারগণ এতে যোগ দেন ‘ওভার-ইনভয়েসিং’ (আমদানী রশিদে ক্রয় মূল্যের তুলনায় অনেক বেশী উঁচু দাম লিখিয়ে নেওয়া), লাইসেন্স অনুমোদন, ইত্যাদি ‘রেন্ট-সিকিং’ কার্যকলাপের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের আশায়।

খোঁজ নিলে দেখা যাবে, যেসব শিল্পোন্নত দেশ প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে সেই একই দেশ থেকে উচ্চমূল্যের পণ্য আমদানী করা হচ্ছে। সুতরাং যেসব দেশ এইসব পণ্য রপ্তানী করে তারা প্রয়োজনীয় পরিমাণ উচ্চমূল্যের পণ্য বিক্রি করতে পেরেই সন্তুষ্ট থাকে। তিনটি সংশ্লিষ্ট স্বদেশী শ্রেণী (ট্রেডার, আমলা ও ক্ষমতাসীন রাজনীতিক) ও তাদের বিদেশী মক্কেল (রপ্তানীকারী) তাদের ভাগ-বাটোয়ারা বুঝে পায় এবং প্রকল্প ব্যর্থ হয়, কারণ প্রকল্পের সফলতার বিষয়টি গোড়া থেকেই তাদের ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না।

(৪) উপসংহার

‘প্রতিযোগিতা’ হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার বুনিয়াদ। দুর্ভাগ্যবশতঃ শিল্পোন্নত দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থনীতিকরা যখন উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে কথা বলেন তখন তাঁরা এই মৌলিক নীতিটি ভুলে বসেন। ফলতঃ তাঁদের নাকের ডগা দিয়ে অসংখ্য অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর প্রকল্প উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনুমোদন হয়ে যাচ্ছে - তাঁরা কোন সাড়াশব্দও করছেন না।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ‘মুক্তবাজার প্রতিযোগিতা’ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিতে অনুকূল সুফল বয়ে নিয়ে আসছে। পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে মুক্তবাজার প্রতিযোগিতা এই দেশগুলিকে অগ্রগতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছে। অপরদিকে, চিনদেশ একদলীয় তথাকথিত কমিউনিস্ট প্রশাসন এবং কঠোর রাস্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনাধীনে দেশের অভ্যন্তরে মুক্তবাজার প্রতিযোগিতা প্রয়োগের মাধ্যমে অভূতপূর্ণ উন্নতি সাধন করে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতাই অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী একটি অসম ভারসাম্য সৃষ্টি করে রেখেছে। অন্তরায়গুলি কিভাবে কাজ করে তা আমরা পরবর্তী একটি নিবন্ধে আরো তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করবো।

এই নিবন্ধের মাধ্যমে মুক্তবাজার প্রতিযোগিতার সম্ভাব্য সুফল ও কুফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। মূলকথা হচ্ছে, পুঁজিবাদী মুক্তবাজার প্রতিযোগিতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য থেকেই আমাদের নির্ধারণ করা উচিৎ কোন্ ধরণের প্রতিষ্ঠান সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের উন্নতির পক্ষে কাজ করতে পারে এবং কোন্ ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রকল্প বাংলাদেশী মানুষের উৎপাদনশীলতা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম।